নাটোর | রেজি: নং-রাজ: ১৬১ | বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | ২৯ বর্ষ

The Weekly Hishab
সাপ্তাহিক হিসাব
অন্তরালের সকল হিসাব এক কাগজে

শিক্ষা-সাহিত্য

বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য অশনি সংকেত: ছাত্রদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে কলমের পরিবর্তে অস্ত্র

মোঃ মুখলেছুর রহমান প্রকাশ: ২২ অক্টোবর ২০২৬ ৭ মিনিট পাঠ



যে দল ক্ষমতায় আছে, আগামীকাল সে দল বিরোধী দলে যেতে পারে।

শিক্ষাঙ্গন একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণের কারখানা। যে বয়সে তরুণদের হাতে থাকার কথা বই, খাতা ও কলম; যে বয়সে তাদের ব্যস্ত থাকার কথা জ্ঞানচর্চা, গবেষণা, বিতর্ক, খেলাধুলা ও সৃজনশীল কর্মকান্ডে— সে বয়সে যদি তাদের হাতে উঠে আসে অস্ত্র, তাহলে সেটি শুধু শিক্ষাঙ্গনের সমস্যা নয়; এটি পুরো সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয়। প্রশ্ন হলো— আমরা আমাদের সন্তানদের কোন ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করছি? তাদের হাতে কি থাকবে জ্ঞান ও দক্ষতার অস্ত্র, নাকি থাকবে লাঠি, রড, ধারালো অস্ত্র কিংবা আগ্নেয়াস্ত্র? এই প্রশ্ন এখন আর কেবল তাত্ত্বিক নয়। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি শিক্ষাঙ্গনে সহিংসতার নতুন করে ফিরে আসার

আশঙ্কা তৈরি করেছে। ২০২৬ সালের আগস্টে মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা, ঢাকা কলেজ এবং রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে এসব ঘটনায় ৯০ জনের বেশি মানুষ আহত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সংঘর্ষে লাঠি, লোহার রড ও দেশীয় অস্ত্র ব্যবহারের কথাও উঠে এসেছে। এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ কোনো রাজনৈতিক দলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র নয়। এটি জ্ঞানচর্চার স্থান, গবেষণার স্থান, মুক্তবুদ্ধির চর্চার স্থান এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরির স্থান। সেখানে যদি শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার চেয়ে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তাহলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই প্রশ্নের মুখে পড়ে।

ছাত্ররাজনীতির গৌরবময় ঐতিহ্য বনাম বর্তমান বাস্তবতা

বাংলাদেশের ইতিহাসে ছাত্রসমাজের অবদান অস্বীকার করার সুযোগ নেই। ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনসহ দেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ও অধিকারভিত্তিক আন্দোলনে শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সুতরাং ছাত্ররাজনীতিকে এক কথায় অস্বীকার করা সমস্যার সমাধান নয়। বরং প্রশ্ন হওয়া উচিত— ছাত্ররাজনীতি কেমন হবে? আদর্শভিত্তিক ছাত্ররাজনীতি কি শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব, গণতন্ত্র, সামাজিক দায়িত্ব ও জনসেবার শিক্ষা দেবে, নাকি তা হবে দলীয় আনুগত্য, হলের নিয়ন্ত্রণ, প্রভাব বিস্তার ও প্রতিপক্ষকে দমনের হাতিয়ার? সাম্প্রতিক পরিস্থিতি দ্বিতীয় আশঙ্কাটিকেই সামনে নিয়ে আসছে। একটি গবেষণামূলক বিশ্লেষণেও বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির ঐতিহাসিক ভূমিকার পাশাপাশি ক্যাম্পাস সহিংসতার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা এবং ২০২৬ সালের আগস্টে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ক্যাম্পাসে সংঘর্ষের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। (ওঝঅঝ)

অস্ত্র কীভাবে শিক্ষাঙ্গনে ঢোকে?

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি এখানেই। একজন শিক্ষার্থী নিজে অস্ত্র তৈরি করে ক্যাম্পাসে নিয়ে আসে— এমন সরল ব্যাখ্যা দিয়ে সমস্যার গভীরে পৌঁছানো সম্ভব নয়। অস্ত্রের সঙ্গে অর্থ, সরবরাহ, সংগঠন, আশ্রয়, প্রভাব এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার সম্পর্ক থাকতে পারে। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আবাসিক হলের কয়েকটি কক্ষ থেকে শিক্ষার্থীরা ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করেছিল। একই সময়ে দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি হল থেকে শতাধিক ধারালো অস্ত্রসহ রড, লোহার পাইপ, হকিস্টিক ও বাঁশের লাঠি উদ্ধারের খবর প্রকাশিত হয়। ২০২৫ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা অফিসে সংরক্ষিত স্থানীয়ভাবে তৈরি অস্ত্রের একটি অংশ সংঘর্ষের

সময় নিয়ে যাওয়ার ঘটনাও সামনে আসে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, আগে হলগুলো থেকে জব্দ করা প্রায় ১৩০টি অস্ত্র নিরাপত্তা অফিসে রাখা ছিল। এসব ঘটনা থেকে অন্তত একটি বিষয় স্পষ্ট— শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের উপস্থিতিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই।

শুধু অস্ত্রধারীকে ধরলেই সমাধান হবে না

অবৈধ অস্ত্র বহন বা ব্যবহার করলে অবশ্যই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু শুধু অস্ত্রধারী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করলেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না। তদন্ত করতে হবে— অস্ত্র কোথা থেকে এসেছে? কে বা কারা তা সরবরাহ করেছে? অর্থের উৎস কী? ক্যাম্পাসে কারা অস্ত্র সংরক্ষণ বা সরবরাহের সুযোগ পেয়েছে? কোনো রাজনৈতিক, স্থানীয় বা প্রভাবশালী মহল এর সঙ্গে যুক্ত কি না? প্রশাসন আগে থেকে কিছু জানত কি না? জানলে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর বের করা জরুরি। অস্ত্রের উৎস অদৃশ্য রেখে শুধু অস্ত্র বহনকারীকে শাস্তি দিলে মূল সমস্যা থেকেই যাবে।

আইন সবার জন্য সমান হতে হবে

শিক্ষাঙ্গনে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিরপেক্ষতা। কোনো শিক্ষার্থী যদি অপরাধ করে, তার রাজনৈতিক পরিচয় যেন তাকে আইনের ঊর্ধ্বে না রাখে। আবার রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে নিরপরাধ কাউকে হয়রানিও করা যাবে না। অস্ত্রধারী ব্যক্তি যে সংগঠনেরই হোক, তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। একইভাবে সংঘর্ষে জড়িত প্রত্যেক পক্ষের অপরাধের তদন্ত হতে হবে একই মানদন্ডে। কারণ নির্বাচিতভাবে আইন প্রয়োগ করলে আইনশৃঙ্খলার প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট হয় এবং এক পক্ষ মনে করতে পারে— ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে শুধু অস্ত্রধারীর পরিচয় বদলেছে, সংস্কৃতি বদলায়নি। এই সংস্কৃতি পরিবর্তন করাই সবচেয়ে জরুরি।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দর্শকের ভূমিকায় থাকতে পারে না

ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রথম দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের। রাজনৈতিক দল বা ছাত্রসংগঠন নয়। শিক্ষাঙ্গনে বহিরাগতদের অবাধ প্রবেশ, আবাসিক হলে অবৈধ নিয়ন্ত্রণ, অস্ত্র সংরক্ষণ, সংঘর্ষের প্রস্তুতি কিংবা প্রকাশ্য শক্তি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে আগেই ব্যবস্থা নিতে হবে। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারও বাড়াতে হবে। পরিচয়পত্রের কার্যকর ব্যবহার, প্রবেশপথে নজরদারি, সিসিটিভি, দ্রুত প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা, জরুরি অভিযোগের ব্যবস্থা এবং ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার করা প্রয়োজন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ২০২৬ সালের মে মাসে একটি গুরুতর অপরাধের পর ১৪ দফা নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণ

করেছিল; এর মধ্যে পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক করা, বহিরাগতদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, সিসিটিভি বৃদ্ধি, জরুরি প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা এবং অননুমোদিত প্রবেশপথ বন্ধ করার মতো উদ্যোগ ছিল। এ ধরনের ব্যবস্থা শুধু কোনো একটি ঘটনার পর নয়, সব বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ হওয়া প্রয়োজন।

রাজনীতির সঙ্গে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক থাকবে, কিন্তু অস্ত্রের নয়

রাজনীতি মানুষের অধিকার ও কল্যাণের জন্য। ছাত্ররাজনীতির মূল উদ্দেশ্যও হওয়া উচিত শিক্ষার্থীদের অধিকার রক্ষা, নেতৃত্বের বিকাশ, সামাজিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি করা। কিন্তু যদি ছাত্ররাজনীতি হয়ে ওঠে হল দখলের প্রতিযোগিতা, টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ, চাঁদাবাজি, আধিপত্য বিস্তার কিংবা প্রতিপক্ষকে ভয় দেখানোর মাধ্যম, তাহলে সেটি ছাত্ররাজনীতি হিসেবে তার নৈতিক বৈধতা হারায়। দলীয় রাজনীতির সঙ্গে ছাত্রসংগঠনের সম্পর্ক থাকতেই পারে— এটি রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বিতর্কের বিষয়। কিন্তু দলীয় সম্পর্ক কখনোই শিক্ষার্থীর হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার নৈতিক বা আইনগত অনুমতি হতে পারে না। রাজনৈতিক দলেরও দায়িত্ব আছে। কোনো দলের ছাত্রসংগঠন যদি সহিংসতায় জড়িয়ে পড়ে, শুধু প্রতিপক্ষের সংগঠনের সমালোচনা করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। নিজ সংগঠনের কর্মী-সমর্থকদেরও জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। কারণ আজ যে দল ক্ষমতায় আছে, আগামীকাল সে দল বিরোধী দলে যেতে পারে। কিন্তু সহিংস রাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকে গেলে তার শিকার হবে পুরো সমাজ।

২০২৪-এর অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার

২০২৪ সালের আন্দোলনের সময় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহিংসতার ভয়াবহতা দেশবাসী দেখেছে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ, রাজনৈতিক সংঘাত এবং ক্যাম্পাসে অস্ত্রের উপস্থিতি সমাজকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতার পর প্রত্যাশা ছিল— শিক্ষাঙ্গনকে রাজনৈতিক সহিংসতার সংস্কৃতি থেকে মুক্ত করার একটি দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ নেওয়া হবে। কিন্তু ২০২৬ সালের বিভিন্ন ক্যাম্পাসে নতুন করে সংঘর্ষের ঘটনা সেই প্রত্যাশাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। এমনকি সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনাও আতঙ্ক সৃষ্টি করে; পুলিশ ঘটনাস্থলের সিসিটিভি বিশ্লেষণের মাধ্যমে জড়িতদের শনাক্ত করার উদ্যোগ নেয়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাশে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা মানে শুধু একটি আইনশৃঙ্খলা সমস্যা নয়; এটি শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ সম্পর্কে একটি ভয়ংকর বার্তা।

সাধারণ শিক্ষার্থীদের কথা কে বলবে?

সহিংস ছাত্ররাজনীতির সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী সাধারণ শিক্ষার্থীরা। তারা কোনো পক্ষের মিছিলে যেতে চায় না। তারা হল দখল করতে চায় না। তারা প্রতিপক্ষকে মারতে চায় না। তারা শুধু ক্লাস করতে চায়, পরীক্ষা দিতে চায়, গবেষণা করতে চায় এবং নিরাপদে বাড়ি ফিরতে চায়। ২০২৬ সালের আগস্টের সংঘর্ষের সময় সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কথাও সংবাদ প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন তুলেছেন— তারা যখন ক্লাস ও পরীক্ষার জন্য ক্যাম্পাসে আসে, তখন কেন তাদের রাজনৈতিক সংঘাতের ঝুঁকি নিতে হবে? এই প্রশ্নের জবাব রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন— সবারই দিতে হবে।

অস্ত্র নয়, দক্ষতার প্রতিযোগিতা চাই

আমাদের তরুণদের শক্তি বিপুল। এই শক্তিকে যদি সঠিক পথে পরিচালিত করা যায়, তারা অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, গবেষণা ও সামাজিক পরিবর্তনে অসাধারণ অবদান রাখতে পারে। কিন্তু সেই শক্তিকে যদি সংঘর্ষে ব্যবহার করা হয়, তাহলে একটি জাতি তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ নষ্ট করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিযোগিতা হোক কে ভালো গবেষণা করতে পারে, কে ভালো বিতর্ক করতে পারে, কে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে পারে, কে উদ্যোক্তা হতে পারে, কে দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে, কে সমাজের জন্য ভালো উদ্যোগ নিতে পারে। কে বেশি শক্তিশালী— তার প্রতিযোগিতা নয়; কে বেশি যোগ্য ও মানবিক— তার প্রতিযোগিতা হওয়া উচিত।

এখনই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়

অস্ত্র শিক্ষাঙ্গনে ঢুকে পড়ার পর সেটিকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে মেনে নেওয়া ভয়ংকর ভুল। আজ লাঠি ও রড, কাল ধারালো অস্ত্র, পরশু আগ্নেয়াস্ত্র— এই ধারাবাহিকতা কোনো সভ্য সমাজের জন্য কাম্য হতে পারে না। রাষ্ট্রকে অবৈধ অস্ত্রের উৎস বন্ধ করতে হবে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে শক্ত হাতে ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ নিতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের ছাত্রসংগঠনের কর্মকাণ্ডের জন্য রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। আর শিক্ষার্থীদেরও বুঝতে হবে— অস্ত্র হাতে নেওয়া নেতৃত্বের পরিচয় নয়; এটি ভবিষ্যৎ ধ্বংসের পথ। আমরা এমন বাংলাদেশ চাই না, যেখানে একজন মা সন্তানকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে অপেক্ষা করবেন— সে আজ ক্লাস শেষে নিরাপদে ফিরবে তো?

আমরা এমন শিক্ষাঙ্গন চাই, যেখানে রাতের অন্ধকারে অস্ত্রের ঝনঝনানি নয়, লাইব্রেরিতে পড়ার শব্দ শোনা যাবে; সংঘর্ষের ভিডিও নয়, গবেষণার ফলাফল আলোচনায় আসবে; রাজনৈতিক আধিপত্য নয়, মেধা ও যোগ্যতা হবে মর্যাদার মাপকাঠি। আকাশে কালো মেঘ

জমলে ঝড়ের অপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আগেই সতর্ক হতে হয়, প্রস্তুতি নিতে হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হয়। শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের উপস্থিতি সেই কালো মেঘেরই একটি সংকেত। ছাত্রের হাতে অস্ত্র নয়— কলম থাকুক। ক্যাম্পাসে সংঘাত নয়— যুক্তির প্রতিযোগিতা হোক। দখল নয়— জ্ঞানচর্চা হোক। ভয় নয়— নিরাপত্তা থাকুক। আর আমাদের তরুণ প্রজন্ম হোক অস্ত্রের নয়, জ্ঞান, দক্ষতা, নৈতিকতা ও মানবিকতার শক্তিতে শক্তিশালী।